بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৪শে অক্টোবর, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধাভিযানে মুসলমানদের প্রস্তুতির বিবরণ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও আমি তাবূকের যুদ্ধের কিছু ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরব। **জাদ বিন উকায়েস** নামক এক ব্যক্তির ঘটনা পাওয়া যায়, সে একজন মুনাফিক স্বভাবের লোক ছিল এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের পর মুনাফিকদের দ্বিতীয় বড়ো নেতা ছিল। সে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও বয়আত করে নি। মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে যাওয়ার কথা বললে সে অজুহাত পেশ করে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিন আর আমাকে দয়া করে কোনো ফিতনাতেও জড়াবেন না। খোদার কসম! আমার জাতি আমার সম্পর্কে অবগত যে, আমার চেয়ে অধিক নারীলোভী আর কেউ নেই, তাই আমি ভয় পাচ্ছি; রোমান নারীদের দেখলে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। মহানবী (সা.) তার এ কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, যাও তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন এবং আরও অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতার একথা শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছ না— এটি তোমার কপটতা। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর ওপর নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। বর্ণিত হয়েছে, তার সম্পর্কে সূরা তওবার ৫০ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল আর তার অর্থ হলো, **আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' শুনে নাও, এরা তো ফিতনার মধ্যেই পড়ে আছে।** তবে পরবর্তীতে তিনি তওবা করেছিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে ইন্তেকাল করেন।

মদীনায় মুনাফিক এবং ইহুদীরা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে অনেক চেষ্টা করে। এক বর্ণনায় আছে, মুনাফিকরা একটি আস্তানা বানিয়েছিল, সেখানে তারা একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করত। একথা জানার পর মহানবী (সা.) হযরত তালহা (রা.)-কে এ নির্দেশ দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন যে, আগুন লাগিয়ে সেটিকে ধ্বংস করে দাও। ফলে নির্দেশ অনুসারে এমনটিই করা হয়। মহানবী (সা.)-এর দয়া ও কৃপার দৃষ্টান্ত এরূপ ছিল যে, এরপরও তিনি তাদের কাউকে বন্দি বা হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন নি। কিন্তু সেই স্থানে যেহেতু ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল তাই তিনি (সা.) তা কঠোরভাবে দমন করেছেন। হুযূর (আই.) এ স্থানে বলেন, **এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখা উচিত, নেযাম বিরোধী কোনো বিষয় দেখা দিলে কঠোরতাও করতে হবে, তখন নম্রতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই।**

সাহাবীরা সবাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাধ্যমত আর্থিক কুরবানীও করছিলেন। মহানবী (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, **এ যুদ্ধে আমাদের সাথে যেন তারাই যায় যারা শক্তিসামর্থ্য রাখে, সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারবে এবং যাদের কাছে বাহন ও যথেষ্ট পাথেয় রয়েছে।** তবে অনেক সামর্থ্যবান সাহাবী অন্যদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন। ঐ সময়ে কয়েকজন দরিদ্র ও অসহায় সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের

অপারগতার কথা জানিয়ে তাদের জন্য কমপক্ষে বাহনের বা পায়ের জুতার আবেদন করেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, আমার কাছে এখন তোমাদেরকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। একথা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফেরত চলে যান। তবে পরবর্তীতে তাদের বাহনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আশআরী গোত্রের কয়েকজন লোক হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য কয়েকটি বাহন প্রদানের আবেদন করতে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে তখন কোনো উট ছিল না, তাই তিনি (সা.) কিছুটা রাগতস্বরেই বলেন, **খোদার কসম! আমার কাছে বাহন নেই আর আমি তোমাদেরকে কিছু দিতে পারব না।** এরপর তিনি (রা.) ফেরত চলে যান। পরক্ষণেই মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র কাছ থেকে কয়েকটি উট ক্রয় করে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং সেগুলো প্রদান করেন। মহানবী (সা.)-এর কসম খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করা হয় যে, তিনি (সা.) কসম কেন খেয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি (সা.) যখন বাহন দিতে অস্বীকার করেন তখন তারা এটি মেনে নিতে পারছিল না, কেননা তারা নতুন মুসলমান হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে জানত না। তাই তাদের সন্তুষ্টির জন্য এবং জোরালোভাবে বুঝানোর জন্য এমনটি করেছেন। আরবের লোকেরা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য কথায় কথায় কসম খেত যা আরবের একটি প্রচলিত রীতি ছিল। আর পরবর্তীতে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ডেকে উট দেয়ার বিষয়টি হলো, মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন উট সহজলভ্য হয় তখন তিনি তা প্রদান করেন, এর আগ পর্যন্ত তাঁর কাছে বাস্তবিক অর্থেই কোনো বাহন ছিল না।

যুদ্ধযাত্রায় যাওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে মদীনার আমীর এবং হযরত সিবা বিন উরফাতা (রা.)-কে নায়েব নিযুক্ত করেন। এছাড়া হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.)-কে আহলে বায়তের নিগরান মনোনীত করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতূম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন। এ সময় হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্তে মুনাফিকরা তাকে নানা ধরনের অপমানজনক কথা বলতে থাকে। এগুলো শুনে হযরত আলী (রা.) তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে জারাফ নামক স্থানে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজের দুশ্চিন্তা ও ভীতির কথা উল্লেখ করলে তিনি (সা.) তার মনস্তুষ্টি করে বলেন, **তুমি কী এটি পছন্দ করবে না যে, আমার জন্য তুমি তেমনি হবে যেমনটি মূসার জন্য ছিল হারুন, কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার অবর্তমানে তুমি নবী নও।** এরপর তিনি (রা.) সন্তুষ্ট হয়ে মদীনায় ফেরত চলে যান।

তাবূকের যুদ্ধে অধিকাংশের মত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যাদের মাঝে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। এ সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আরো কম বা বেশিও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) প্রত্যেক গোত্রকে পতাকা বানাতে বলেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের হাতে সবচেয়ে বড়ো পতাকাটি তুলে দেন। এছাড়া হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.), মতান্তরে হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)-কেও পতাকা প্রদান করেছিলেন। তিনি (সা.) বৃহস্পতিবার সফর শুরু করেন এবং মদীনার নিকটবর্তী স্থান সানিয়্যাতুল বিদায় পৌঁছে সৈন্যবাহিনী চূড়ান্তভাবে গঠন করেন। সানিয়্যাতুল বিদা থেকে একটি দল মদীনায় ফেরত চলে আসে যার নেতৃত্বে ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল। সে মুনাফিকদের নেতা ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সে

বের হলেও পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আর বলে, এত গরমের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার শামিল। উহুদের যুদ্ধের ন্যায় সে ভেবেছিল, তাদের ফিরে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের সাহস বা মনোবল কমে যাবে। কিন্তু এবার এমনটি হয় নি আর মুসলমানদের ওপর এর কোনো মন্দ প্রভাবও পড়ে নি। সানিয়্যাতুল বিদায় মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন সশস্ত্র ব্যক্তি আসে। সে কারো দাস ছিল আর মনিবের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে অংশ নিতে চলে আসে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি তাকে প্রদান করেন নি, বরং তাকে তিনি (সা.) বলেন, **তুমি ফিরে যাও। কেননা নিহত হলে তুমি আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।**

সব ধরনের বাহ্যিক প্রস্তুতির পাশাপাশি যাত্রা শুরুর আগ পর্যন্ত মহানবী (সা.) এ দোয়া করতে থাকেন, اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْاَرْضِ **অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি এ দলকে ধ্বংস করো তাহলে ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।** আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি (সা.) প্রথম যুদ্ধ, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে এ দোয়া করেছিলেন আবার জীবনের শেষ যুদ্ধেও এ দোয়াই করেন। যাহোক, প্রচণ্ড গরম, দীর্ঘ সফর এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা নিয়ে এবং মুনাফিকদের প্রোপাগাণ্ড সত্ত্বেও ত্রিশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথনির্দেশক হিসেবে মহানবী (সা.) **আলকামা (রা.) এবং তার পিতাকে** মনোনীত করেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম স্মৃতিচারণ ইন্দোনেশিয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ **মরহুম জনাব গোলাম মুহিউদ্দীন সোলায়মান সাহেবের,** যিনি সম্প্রতি ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **জনাব ডাক্তার মুহাম্মদ শফিক সায়গল সাহেবের,** যিনি মুলতান জেলার আমীর ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। তৃতীয় স্মৃতিচারণ পারভেজ মিনহাস সাহেবের সহধর্মিনী **শ্রদ্ধেয়া বুশরা পারভেজ মিনহাস সাহেবার,** তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)